অমরেন্দ্র, তুমি

সৌরীন ভট্টাচার্য

অমরেন্দ্র, তুমি 'ভূমিকম্পের রাত'-এর শাদা পাতায় যা লিখে দিয়েছ তাতে এত দিনের এত কথা জেগে উঠল, তা রীতিমতো বিপজ্জনক। এই বুড়ো বয়সে পুরনো স্মৃতি অমন করে উশকে দিলে এই এখনকার সাজানো ছবি ভেঙেচুরে বিশৃঙ্খল হয়ে যায়। তাছাড়া পুরনো স্মৃতির একটার টানে আর একটা এমনভাবে উথলে উঠতে চায় যে তাদের ঘুম পাড়ানো তখন শক্ত হয়ে পড়ে। আর প্রশ্রয় দিলে তোমার মেয়েরা মুখ টিপে হাসবে। কী দরকার।

মহাশ্বেতা যেদিন আমাকে ফোন করেছিল, আমি এত তৎপরতার সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম যে আমারই হাসি পাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যে আমি যেন ফোনটার অপেক্ষাই করছিলাম। অথচ এরকম যে একটা বইয়ের চেষ্টা চলছে এমন কোনও কথা আমার কানে আসেইনি এর আগে। হিসেব করলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারতাম যে অমরেন্দ্রর বয়স আশি ছুঁতে চলেছে। আমরা সবাই পেরিয়ে এসেছি বেশ কয়েক বছর আগে, তাহলে অমরেন্দ্রই বা পিছিয়ে থাকবে কেন। সবারই বয়স তো একসঙ্গে বাড়ছে। কাজেই কিছু করার নেই।

মহাশ্বেতাকে আমি তৎপরতার সঙ্গে এও বললাম যে, অমরেন্দ্রর কবিতা নিয়ে কথা বলায় আমার আগ্রহ। কিন্তু ওর পরের দিকের বই আমার কাছে নেই। সেও সাগ্রহে বই পাঠিয়ে দেবার কথা বলল। দিলও বটে। এত সব কিছু যে দ্রুত ঘটে গেল তার অব্যক্ত রহস্য আছে অমরেন্দ্র, তোমার ওই শাদা পাতার দু-চার লাইন লেখায়। আসলে ওটা তো একটা সময়ের কথা। সে সময়টা ছিল একদিন। তোমার ছিল, আমার ছিল। আমাদের মতো হয়তো আরও কারও কারও ছিল। কিন্তু সেই সময় আজ নেই, তোমারও নেই, আমারও নেই, হয়তো কারও ক্ষেত্রেই একরকমভাবে থাকে না।

অমরেন্দ্র, শাদা পাতায় যা তুমি লিখেছ সে কবিতা পাগলামির কথা। এ পাগলামি খুব বাস্তব। শুধু কবিতাতেই থাকে তা হয়তো নয়। হয়তো সব কিছু নিয়েই পাগলামি হতে পারে। যার যেটা, এইটুকুই শুধু বলা যায়। কার কতদিন তাও কিছু বলা যায় না। কত ট্র্যাজেডি লুকিয়ে থাকে এ সবের মধ্যে। কলেজের ফার্স্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ারে যে বন্ধু খাতার পর খাতা ভর্তি করছে কবিতায় তার মুখের ম্লান হাসি দেখেছি। দেখা হয়েছে অনেক বছর বাদে। ততদিনে জীবনের ধারা বদলে গেছে আমাদের দুজনেরই।

অনেক কথার পরে জিজ্ঞাসা করলাম সেই কবিতার কথা। লাজুক ম্লান হাসিতে চুপ করে থাকে বন্ধু। হয়, এরকম হয়, অনেকেরই হয়।

অমরেন্দ্র, কবিতা তখন তোমাকে পেয়ে বসেছিল। তোমার ঊনিশ-কুড়ি বছর বয়সেই তোমার সেই নিখিল ভারত ছাত্র সাহিত্য সম্মেলন, যা প্রকারান্তরে হয়তো কবিতার ভারত জয়। শেষ পর্যন্ত কী হয়েছিল তা আর আমার মনে নেই। তুমি তখন দিল্লি থেকে বম্বে চলে গেলে, তারপর আমরা মেতে গেলাম লুমুম্বা নিয়ে। কঙ্গো, লুমুম্বা, নতুন আফ্রিকার উত্থান, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে তখনই পড়তে আসছে আফ্রিকার ছাত্রেরা, সম্ভবত বেশি আসছে কেনিয়া থেকে। এইরকম অবস্থায় লুমুম্বার হত্যা। দেশে দেশে ধিক্কার। সোভিয়েতে লুমুম্বার নামে ফ্রেন্ডশিপ ইউনিভার্সিটি। গত শতকের ষাটের দশকের সেই সময়। সে হারিয়ে গেছে।

'কবিতা-পরিচয়'-এর দিনে তোমার পাগলামির কথাই ভাবো না। আমাদের দুই বিখ্যাত পত্রিকার নাম শরীরে ধারণ করে সে পত্রিকার আবির্ভাব। এবং ওই নতুন কবিতা বিচার পদ্ধতি। আমার মতো দু-একজনের হয়তো তখনই কিছু সংশয় ছিল। অব্যক্ত। তা নিয়ে ভেবেচিন্তেখুব কিছু বলার মতো জায়গায় তখন আমি অন্তত ছিলাম না। তবুও খুব নরমভাবে কবিতার শরীরী কঙ্কালের দিকে বেশি বিপজ্জনকভাবে এগিয়ে যাচ্ছি কিনা, এরকম একটা আশঙ্কা অল্প ছিল আমার মনে। তোমার সঙ্গে এ নিয়ে খুব কথা হয়েছিল বলে মনে পড়ে না। তাছাড়া ওই বয়সেই তোমার পত্রিকা সূচিতে যে নামের তালিকা তুমি সাজিয়ে ফেলেছিলে প্রায় যেন খেলার ছলে তাতে আমাদের মূঢ় আশঙ্কার সাধ্য কি যে গোল পাকাবে। জানি কাজটা খেলার ছলে হয়নি,

. . . . . .

সম্পাদকীয় সংযোজন: নিখিল ভারত ছাত্র সাহিত্য সম্মেলন প্রসঙ্গে সংবাদপত্রে প্রকাশিত দুয়েকটি খবর

ছাত্রদের সর্বভারতীয় সাহিত্য সম্মেলন: কলিকাতায় প্রথম অনুষ্ঠান

সম্প্রতি ছাত্রদের উদ্যোগে নিখিল ভারত সাহিত্য সম্মেলন আহ্বানের একটি প্রস্তাব দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি শ্রীধীরেশপ্রতাপ চৌধুরী ও প্রস্তাব কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীঅমরেন্দ্র চক্রবর্তীর মধ্যে আলোচিত হইয়াছে। উক্ত আলোচনায় শ্রীচৌধুরীর মতানুযায়ী স্থির হইয়াছে যে সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইবে।

শ্রীচক্রবর্তী কলিকাতা হইতে দিল্লি আসিয়াছেন স্থানীয় ছাত্রদের সহযোগিতা লাভের জন্য এবং তিনি মনে করেন যে, স্থানীয় ছাত্রদের মধ্যে তিনি যে উৎসাহ লক্ষ্য করিয়াছেন তাহা কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। তিনি আশা করেন যে, প্রস্তাবিত সম্মেলন শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হইবে। তিনি এখানে কয়েকটি কলেজের ছাত্রনেতাদের সঙ্গেও এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বম্বের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলির ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করিবার জন্য ১২ই ডিসেম্বর বম্বের দিকে রওনা হইয়াছেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৬-১২-১৯৬০

MOVE FOR ALL-INDIA STUDENTS' LITERARY CONFERENCE

Mr. Amarendra Chakraborty, Chairman of the proposer committee All India Students' Literary Conference, proposes to the Literary Secretaries of all universities and colleges in India that:-

In view of provincial misunderstanding, regional meanness and brutal frenzy on the linguistic problem in present India, it has been felt that closer contact and

হবার কথাও না। 'কবিতা-পরিচয়'-এর প্রতিটি সংখ্যা তখন ছিল আমাদের গোগ্রাসের খোরাক। আমার সামান্য পদ্ধতিগত সংশয় নিয়েও এ কথা অকপটে সত্য।

তোমার বিক্ষত অন্বেষণ পর্ব। যতদূর বুঝি সেও তোমাকে অমনি করে পেয়ে বসেছিল। শুধু তাই না। হয়তো আরও একটু আছে এই কথাটায়। ভেবে দ্যাখো ওই ষাটের দশকের কফি হাউসের চেহারা। একটা রকমের বোধের সংক্রমণ ছড়িয়ে ছিল ওই কফি হাউস যৌবনের আশেপাশে। অন্বেষণ, দাহ, ক্ষত বিক্ষত, কোনও এক রকমের আদিম পাপের বোধ, এতসব জিনিস তখন আমাদের সময়টাকেই হয়তো আক্রমণ করেছিল। বোদলেয়ার তখন হানা দিচ্ছেন। বীট বংশের শরিকেরা কেউ কেউ এসে সরাসরি পৌঁছে গেছেন কলেজ স্ট্রিটে। আমাদের আত্মশোধনের বকযন্ত্রে নতুন রসের চোলাই হচ্ছে তখন। তার স্বাদ আলাদা। আমাদের এতদিনের চেনা চেহারায় এ জিনিস ঠিক ছিল না আমাদের সম্বলে। তোমার প্রথম কবিতার বই তখন এসেছিল অনেকটাই সময়ের বার্তা নিয়ে। এখন অঙ্কের হিসেব হাতে নিয়ে দেখছি তুমি প্রায় একটা গোটা দশক জুড়ে নিরন্তর ক্ষত বিক্ষত হয়েছ তোমার অন্বেষণে। ততদিনে আমি আবার সরে গেছি আমার অক্ষরেখায় অন্যদিকে। যদিও সত্যের খাতিরে আমাকে বলতেই হবে যে, ব্যক্তিতার স্তরের ওই সংকটের থেকে পুরো মুক্তি হয়তো কখনও হতে পারল না আমার। সে মোকাবিলার গল্প আলাদা। প্রত্যেকের নিজের গল্প নিজেকেই সামলাতে হয়। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে।

তোমার দীর্ঘ কবিতা-বিরতির পরের বই 'নদী জানে, কচি নিমপাতারাও জানে'। আমরা এসে পড়েছি নতুন শতাব্দীতে। ২০০৬-এর এই বই হাতে নিয়ে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ষাটের দশকের সেই আত্মশোধনের বকযন্ত্র পাশে সরিয়ে রেখে

. . . . . .

understanding must be fostered among young writers and other students of all unversities and colleges in India so that they can augment the friendly feelings and national unity among them.

He proposed that a nation-wide literary conference of the student be held annually.

Discussion on various problems on modern Indian literature and the consequent meeting of students of all provinces will, no doubt, be a matter of enormous importance.

The Telegraph, 2-12-1960

নিখিল ভারত ছাত্র সাহিত্য সম্মেলন: প্রস্তাবিত সম্মেলন সম্পর্কে সাহিত্যিক ও অধ্যাপক শ্রেণীর আগ্রহ প্রকাশ

প্রস্তাবিত নিখিল ভারত ছাত্র সাহিত্য সম্মেলন সম্পর্কে কলিকাতার বিভিন্ন সাহিত্যিক এবং অধ্যাপকগণ তাঁহাদের অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ছাত্রদের বার্ষিক সাহিত্য সম্মেলনের এই প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানাইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ সুবোধচন্দ্র মিত্র বলেন যে ইহা নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য কার্য।

ডক্টর মিত্র সম্মেলনের সাফল্য কামনা করেন। সম্মেলনের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির কয়েকজন সদস্যকে শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, প্রস্তুতিকার্যে সহযোগিতা করিতে তাঁহার আপত্তি নাই, যদি ইহার মধ্যে রাজনীতি জড়িত না থাকে। কলিকাতার সাহিত্যিক এবং অধ্যাপকগণকে লইয়া অভ্যর্থনা সমিতি গঠনের যে উদ্যোগ চলিতেছে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, আমাদের পক্ষ হইতে— অন্ততঃ আমার পক্ষ হইতে বলিতে পারি, প্রথমে অধ্যাপকগণকে লইয়াই কমিটি গঠন করা উচিত, তাহার পর আমাদের ডাকুন। পদ্মশ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রস্তাবটিকে প্রশংসা করিয়া বলেন যে, সম্মেলনের কার্যে

এখন অন্য সন্ধানে মন মজেছে। ইতিমধ্যে ঘটেও গেছে অনেক কিছু। একুশ শতকের প্রথম দশকে পৌঁছতে পৌঁছতে যাটের দশকটাই পৌঁছে গেছে প্রৌঢ়ত্বে। তার চুলে তখন পাক ধরেছে। নিমপাতার অনুষঙ্গে মনে আসবেই শঙ্খ ঘোষের সেই ভয় পেয়ে যাওয়া লাইন, কচি নিমপাতারাও যদি ইংরেজি বলে ফেলে। ভয় তো ইংরেজিকে নিয়ে নয়, ইংরেজি 'বলে ফেলাকে' নিয়ে। কত ওলটপালট হল চারদিকে। অনেকের রাগ হল। তোমার রাগ হল, অমরেন্দ্র।

অথচ কাল স্বপ্নের মধ্যে ময়দানে ঈদের নামাজের মতো হাজার-হাজার
কবিতা আমার সামনে নতজানু
আমি তাদের অভিবাদন গ্রহণ করিনি
আমি তাদের বলেছি
দ্যাখো, এসব আমার ভালো লাগছে না। আমি তোমাদের চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিলুম,
এর মধ্যে আমাদের যুগকে মমতাময়ী নারীর মতো করে দিতে হবে,
না-হলে আমি সব ভস্ম করে দেবো। সাবধান! আমার নাম অমরেন্দ্র চক্রবর্তী!
(কাল স্বপ্নের মধ্যে)

তোমার রাগ এখানে তীব্র অভিমানের চেহারা নিয়েছে। প্রায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো। সেই বয়সে রবীন্দ্রনাথকে চিঠিই লিখে বসেছিলেন, 'হয় পৃথিবীটাকে বদলে দাও, নইলে তোমার কবিতা ফিরিয়ে নাও।' এই তো সেই চিরকালীন ক্ষোভ বিক্ষোভ আর মান-অভিমান। কেউ অমনি করে বদলে দেবে না কোনও কিছু। ওরে অবুঝ

. . . . . .

সহযোগিতা করিতে তাঁহার অসম্মতি নাই। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ও শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রস্তাবিত সম্মেলনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। শ্রীবিশী প্রস্তাবটিকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া অভিহিত করেন। কলিকাতার সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উল্লেখ করিয়া শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় বলেন যে, সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইতেছে, সেই জন্যই ইহা অত্যন্ত ব্যাপক আকারে হওয়া উচিত। দক্ষিণারঞ্জন বসু প্রস্তাবটিকে অভিনন্দিত করিয়া বলেন যে, সাম্প্রতিককালে এই জাতীয় সম্মেলনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ছাত্রদের এই জাতীয় সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইলে খুবই ভাল হইবে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, বাংলা দেশই ভারতকে মিলনের আমন্ত্রণ জানাইয়াছে —ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োচিত হইয়াছে। শ্রীবসু এবং শ্রীমুখোপাধ্যায় সম্মেলনের কার্যে সহযোগিতা করিতে সম্মত বলিয়া জানাইয়াছেন। শ্রীগোপাল হালদার প্রস্তাবের অংশবিশেষের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশের ছাত্র প্রতিনিধিদের মিলনের এই প্রস্তাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীমনোজ বসু বলেন যে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত ছাত্র প্রতিনিধিগণের নিকট কলিকাতার ছাত্রগণ তাঁহাদের ঐক্যের পরিচয় দিবেন— ইহাই তিনি আশা করেন। অধ্যক্ষ প্রশান্ত কুমার বসু, ডক্টর অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর দীপ্তি ত্রিপাঠী, ডক্টর গুরুদাস ভট্টাচার্য, ফাদার ফাঁলো এবং অধ্যাপক অনিল কুমার রায় চৌধুরী সম্মেলনের কার্যে সহযোগিতা করিতে সম্মত হইয়াছেন।

আসামের ভাষা সমস্যাকেন্দ্রিক সাম্প্রতিক দুঃখজনক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষেতে অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্র ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির আহ্বায়ক শ্রীঅমরেন্দ্র চক্রবর্তীকে প্রস্তাবিত নিখিল ভারত ছাত্র সাহিত্য সম্মেলন বন্ধ করিয়া দিতে বলেন। অধ্যাপক মিত্র বলেন যে, এইরূপ অশান্ত পরিবেশে সম্মেলন বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত বলিয়া তিনি মনে করেন। শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ সম্মেলন সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করেন।

যুগান্তর, ১০-৭-১৯৬১

বালক, বুঝে নিতে হবে, অমন সোনার কোনও জাদুচাবি কোথাও লুকোনো নেই কারও সিন্দুকে। তাই বলে কি কিছুই কখনও বদলায় না। বদলায়, অবশ্যই বদলায়, তাই তো এই একুশ শতকে এসে দেখেশুনে এত রাগ আর মান-অভিমান। তাই তো কচি নিমপাতার ভাঁজে গুঁজে রেখে যেতে হয় গোপন কথা।

এই কবিতা, 'কাল স্বপ্নের মধ্যে', আগের লেখা। 'নদী জানে, কচি নিমপাতারাও জানে'-র ষোলটা কবিতা একুশ শতকের সমসাময়িক। আগের লেখা তাহলে আরও আগের। কথাটা তুলছি এই কারণে যে, যে লম্বা কবিতা-বিরতির পরে এই নতুন বই, এবং এই নতুন বইয়ের যে নতুন স্বাদ, তার রূপান্তর পর্ব কিন্তু বিরতির মধ্যেই ঘটছিল। সেটাই স্বাভাবিক। বিরতি যে সবাই একেবারে ভেবেচিন্তে নিয়ে থাকেন তা হয়তো নয়। কিন্তু বিরতির মধ্যেও কবিতা তার কাজ করে যায়। অমরেন্দ্র, তোমার ক্ষেত্রেও কবিতা এমনিভাবে কাজ করে গেছে বলেই আমার বিশ্বাস। এখন এসব কথা খানিকটা আন্দাজে বলা ছাড়া গতি নেই। এমনকি তোমাকে বলতে বলেও খুব লাভ হবে না। তুমি তোমার ব্যাপারটা যেরকম দেখেছ বা দেখছ তা তোমারই দেখা। তোমার সে দেখায়, অমরেন্দ্র, তোমার পূর্ণ স্বাধীনতা অবশ্যই প্রাপ্য। তবে অন্যের স্বাধীনতায় হাত দেবার তোমার কোনও হক নেই। সব কবির জন্যই আমার এই নিয়ম। তোমার বাকভঙ্গি নকল করে বলি, 'সাবধান, না সাবধান না, বলি বুঝলে হে বাপু, আমি অমুক, আমি দেখতে চাই বিরতির পরে তোমার উদ্বিগ্ন মুখের ধ্বস্ত বলিরেখা।'

জানি কথাগুলো শোনাচ্ছে হেরো মানুষের মতো। তা আমরা তো হেরেই বসে আছি। অন্তত আর কিছু না পারি সে কথাটা নিজের মধ্যে নিজের মুখে স্বীকার করি। পারিনি। পারিনি আমরা। কত কাজ করার ছিল। আমরা প্রায় কিছুই পারিনি। অন্ধজনের উদ্দেশে, হতজনের স্মৃতিতে তোমার পরের বই 'মৃত্যুর অধিক এই মেরে ফেলা'। অমরেন্দ্র, তুমি এখন হেরোদের সঙ্গী হবার দীক্ষা পেয়েছ।

আমি তো আমার একলা ব্যথা তোমার দলের সঙ্গী নই
আমি তো আমার একলা পথিক তোমার পথের সঙ্গী নই
আমি তো আমার একলা জীবন তোমার জীবনসঙ্গী নই
আমি তো আমার অনিদ্র রাত তোমার শ্মশানসঙ্গী হই।

অমরেন্দ্র, তোমার ক্ষত-বিক্ষত অন্বেষণে কোথাও কি এই দীক্ষার বীজ নিরন্তর তোমাকে নিয়ে গেছে এই নিকষ শ্মশানপথে। তোমার একলা ব্যথা, তোমার একলা পথিকের একলা জীবন, তোমার অনিদ্র রাত তোমাকে ঠায় ঠেলে নিয়ে গেছে এক বধ্যভূমির দিকে। সেখানে সবাইকে সব সময়ে মৃত্যুর জন্যে তৈরি হতে হবে। তাই তবে আজ আমাদের নিয়তি। তাহলে এত যে আশাকিরণের সংলাপ তবে কোথায় অপেক্ষা করে আছে তন্ময় শুশ্রূষা নিয়ে।

অমরেন্দ্র, তুমি চেয়েছিলে পথের দু'পাশে যেন বৃক্ষ থাকে/ ঘরের কাছেই যেন পাখি ডাকে/ গ্রামের কিনারে যেন নদী বয়/ এমন বাড়ির খোঁজ পেলে হয়। এমন বাড়ির খোঁজে তুমি গিয়েছিলে একদিন, মনে পড়ে। আমিও ছিলাম সেদিন তোমার সঙ্গে বেলভেডিয়ারে। বৃক্ষ ছিল, নদী ছিল না। পাখি ছিল অনেক উলটোদিকে

চিড়িয়াখানায়। তবুও...

নিরাশার কথা কবিকে মানায় না। কবিকে তা সত্ত্বেও শুধু কু গেয়ে যেতে হয়। অমনি করেই কবি নিজেকে কুরে কুরে নিজেরই ফলক রচনা করে যান। যে যেমন করে পারে। তুমিও তোমার মতো সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে এসে পৌঁছেছ ভূমিকম্পের রাতে। কবিতাই তোমাকে আচ্ছন্ন করেছিল। কবিতার যন্ত্রণা থেকে তোমার মুক্তি নেই, অমরেন্দ্র। ধরনার কথা তুমি নিজেই লিখেছ। আমি আর কী বলব। তোমার কথাই ফিরিয়ে দিই তোমাকে।

যতক্ষণ ঝড়ের ভিতর থেকে অক্ষর না আসে
আগুনের মর্ম থেকে প্রদীপ না আসে
পথের প্রদাহ থেকে প্রতীক না আসে
মেঘের গর্জন থেকে গৌরব না আসে
বিদেহী বাতাস থেকে বিন্যাস না আসে
অষ্টপ্রহর থেকে আনন্দ না আসে
শব্দের সংস্থান থেকে সন্ন্যাস না আসে
ততক্ষণ বসে থাকবো শ্মশানে-মশানে, সর্বনাশে,
সাদা পাতা, তোমাদের পাশে।
(ধরনা; ভূমিকম্পের রাত)

অমরেন্দ্র, তুমি এ যেখানে এসে পৌঁছলে, ভেবে দ্যাখো আমাদের কত কবি তোমাকে হাতে ধরে এখানে নিয়ে এলেন। বুদ্ধদেব বসু, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, এমনকি জগন্নাথ চক্রবর্তীকেও আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার পিছনে ছায়ার মতো আসছেন তোমাকে আগলে রেখে। ইছামতীর জল-ঢেউ মাখা সেই কবি লিখেছিলেন, আমার অভিমান ছিল বিদ্যুতের, সে বিদ্যুৎ এখনো মেঘে। তাই আমি অভিমানী। অমরেন্দ্র, তুমি বলেছ ধরনার কথা। আমি বলে থাকি, হত্যে দিয়ে পড়ে থাকার কথা। জানি একথা আমার মুখে মানায় না। এও জানি যা আমার মুখে মানায় না, তাই সারাজীবন বলে যাওয়াই আমার দৈবের নির্বন্ধ। অন্তত এটুকু ধক থাকুক আমাদের।

অমরেন্দ্র, তুমি আশি পেরিয়ে এগিয়ে চলো তোমার ছন্দে। আমরা পাশ থেকে দেখে যাব যতদিন পারি।

লেখক পরিচিতি
অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন প্রধান ও সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কৃত প্রাবন্ধিক, লেখক